ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য: ভারসাম্য

সাইয়্যেদ কুতুব

[[illegible] (worldview) : মূল আরবিতে সাইয়িযদ কুতুব তাসাওউর ([illegible]) বযবহার করেছেন। সাধারণত তাসাওউর শবেদর র্অথ করা হয় ‘concept’/‘conception’ বা ধারণ হিসেবে। তবে লেখক এ শবদটিকে আরও বযাপক র্অথে বযবহার করেছেন।
তিনি ইসলামি তাসাওউর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া অস্তিতেবর সামগ্রিক বযাখযাকে। যে বযাখযার মধেয স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষের উৎস ও ভূমিকা, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সমাজ, শাসন—সবই অন্তর্ভুক্ত।
লেখক যে র্অথে তাসাওউর শবদটি বযবহার করেছেন র্অথের দিক থেকে ‘ধারণা’, ‘দৃষ্টিভঙ্গি’ ইতযাদি শবেদর তুলনায় ইংরেজি ওর্য়াল্ডভিউ (worldview) শবদটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যর্পূণ। দুঃখজনকভাবে ওর্য়াল্ডভিউ শবেদর যেসব বাংলা করা হয়েছে, সেগুলো হয় অতযন্ত অপ্রচলিত হবার কারণে অচেনা প্রায়, অথবা মূলভাব প্রকাশে বর্যথ কিংবা দুটোই। তাই অনুবাদে ‘ওর্য়াল্ডভিউ’ শবদটিই বযবহার করা হয়েছে।
সংক্ষেপে ওর্য়াল্ডভিউ হলো :
স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃতযু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার মাধযমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও বযাখযা করার চেষ্টা করে। ওর্য়াল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রতেযকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রতেযকের একটা ওর্য়াল্ডভিউ থাকে৷ হয়তো তারা সেটাকে ‘ওর্য়াল্ডভিউ’-এর মতো গালভরা কোনো শবদ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শবেদর পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধেযই থাকে।]

পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন না। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ : ৩)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—ভারসাম্য। ইসলামের শিক্ষা ও উপাদানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বিদ্যমান। ভারসাম্যের এই বৈশিষ্ট্য ইসলামের সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। ইসলামের সামগ্রিকতা ভারসাম্যপূর্ণ। ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে চরমপন্থা, পরস্পর বিরোধিতা এবং বাহ্যিক প্রভাব থেকে নিরাপদ রেখেছে। অন্যান্য দার্শনিক কিংবা ধর্মীয় ধারণাগুলো বিকৃত হয়েছিল এসব কারণেই। এর মধ্যে অধিকাংশ শুরু থেকেই ভুলের ওপর গড়ে উঠেছিল। অল্প কিছু (যেমন ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টধর্ম) একসময় সঠিক অবস্থানে থাকলেও মানুষের সংযোজন-বিয়োজন আর ভুল ব্যাখ্যার কারণে সেগুলোও বিকৃত

হয়ে গেছে পরে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভারসাম্যের কিছু উদাহরণ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কিছু কিছু দিক আছে যেগুলো স্ব-প্রমাণিত। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এগুলোকে সত্য হিসেবে চিনতে পারি। এগুলোর সত্যতা নিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। আবার ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এমন কিছু দিক আছে, যেগুলো নিয়ে প্রয়োজন আলোচনা ও গবেষণার। এই দিকগুলো দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হয়। দ্বীন ইসলামের এ দুই দিকের মধ্যে ভারসাম্য মানবপ্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করে।

অস্তিত্বের সব রহস্যের নাগাল মানুষের বুদ্ধিমত্তা পায় না, সেগুলোর সবকিছু পুরোপুরি বোঝার সক্ষমতা তার নেই। মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে মহান আল্লাহ এমনভাবে তৈরি করেছেন, যাতে সে যা জানতে পারে এবং যা তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। অজানাকে নিয়ে কৌতূহল আর জানার মাধ্যমে সন্তুষ্টি; মানব চরিত্রে এ দুইয়ের মধ্যে একধরনের ভারসাম্য আছে। ঠিক যেমন ভারসাম্য আছে অস্তিত্বের প্রকৃতির ব্যাপারে, যা জানা সম্ভব আর যা জানা সম্ভব না; তার মধ্যে। মানবচরিত্রের মধ্যে থাকা ভারসাম্য, অস্তিত্বের মধ্যে থাকা ভারসাম্যের প্রতিফলন।

যে বিশ্বাসব্যবস্থায় মানুষের সীমিত বুঝকে অতিক্রম করে যাবার মতো কোনো উপাদান নেই, তাকে আসলে বিশ্বাস বলা যায় না। এমন বিশ্বাসের প্রতি মানবাত্মা খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে না। কৌতূহলকে জাগ্রত করা অথবা মানুষের ভেতরে রহস্যকে জানার যে আকুলতা কাজ করে, তা সন্তুষ্ট করার মতো এমন কিছু বিশ্বাসব্যবস্থায় থাকে না। অন্যদিকে, কোনো বিশ্বাস যদি পরস্পরবিরোধী হয়, এত গভীরভাবে রহস্যে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয় যে তা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে বিহ্বল করে ফেলে—সেক্ষেত্রে মানুষের মন তা বিশ্বাস করতে চায় না। মানুষের প্রয়োজন এমন আকীদা, যা তার চিন্তাকে আলোকিত করবে; কিন্তু পরস্পরবিরোধী হবে না অথবা তাকে ধাঁধায় ফেলে দেবে না। মানুষের মন এমন কিছু চায়, যা বোঝার পর কাজে পরিণত করা সম্ভব। এমন বিশ্বাস, যা প্রয়োগ করা যায় বাস্তব জীবনে।

একটা সামগ্রিক বিশ্বাসব্যবস্থায় এদুটো দিক সঠিক মাত্রা এবং পরিমাণে থাকতে হয়, যাতে এর মধ্যে মানুষ তার নিজের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিভা আর সম্ভাবনার সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। ইসলামি বিশ্বাসে এমন কিছু দিক আছে, যেগুলোর বাস্তবতা বোঝা মানুষের পক্ষে পুরোপুরিভাবে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর যাত, তাকদীর, রূহের মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান সবসময় সীমিত থেকে যাবে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছে অনুযায়ী সৃষ্টি করার সামর্থ্য—মানুষের পক্ষে একটা মাত্রা পর্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, মানুষের বুদ্ধিমত্তা সহজাতভাবে স্রষ্টার মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার আবশ্যকতা বুঝতে পারে। কোনো সত্তাকে যদি স্রষ্টা হতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই এই গুণগুলোর অধিকারী হতে হবে। আর স্রষ্টার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার প্রমাণ ইসলাম আমাদের দেয়।

ইসলাম মহাবিশ্ব এবং এর উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তার কথা জানায়। মহাবিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্কের কথা জানায়। জানায় প্রাণ ও প্রাণের বিভিন্ন ধরন এবং মহাবিশ্ব আর স্রষ্টার সাথে প্রাণের সম্পর্কের ব্যাপারে। ইসলামে আছে মানুষ ও তার প্রকৃতির ব্যাপারে

শিক্ষা। আছে মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দরকারি সঠিক জীবনব্যবস্থা। এসব শিক্ষা ইসলাম উপস্থাপন করে স্পষ্ট, যৌক্তিক ও সহজভাবে। এই শিক্ষাগুলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। মানুষ সহজাতভাবে তা গ্রহণ করে নেয়। কুরআনে এসেছে,

> তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না। (সূরা তূর, ৫২ : ৩৫-৩৬)

> তারা (মুশরিকরা) যেসব মাটির দেবতা গ্রহণ করেছে, সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ ছাড়া আরও অনেক ইলাহ থাকত, তবে (আসমান ও জমিন) উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। নাকি তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে? বলুন, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো। আমার সাথে যারা আছে, এটি তাদের জন্য উপদেশ এবং আমার পূর্বে যারা ছিল, তাদের জন্যও এটাই ছিল উপদেশ।' কিন্তু তাদের (অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের) অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২১-২৪)

> যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ (আবার) সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়। আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১-৮২)

> বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি!' শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, নাকি তারা; যাদেরকে শরীক তারা করে্, নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও জমিন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি?্, তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ নির্ধারণ করে। নাকি তিনি, যিনি জমিনকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি জল-স্থলের গভীর অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) অনুগ্রহের পূর্বক্ষণে শুভবার্তাবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তারা যাকে (আল্লাহর) শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিয্ক দান করেন? বলুন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।' (সূরা নাম্ল, ২৭ : ৫৯-৬৪)

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে

পড়ছো। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ হতে। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শোনে। তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হলো এই যে, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভীতি ও ভরসা সঞ্চারীরূপে। আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে—তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার আহ্বান করবেন, তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ : ২০-২৫)

এই আয়াতগুলোতে মানুষ এবং মহাবিশ্বের ব্যাপারে বেশ কিছু অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। সৃষ্টির মাঝে থাকা এই নিদর্শনগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে আল্লাহ মানুষকে আহ্বান করেছেন। কুরআনের এধরনের আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, মহান আল্লাহর ইচ্ছা চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। মানবীয় যুক্তি অনুযায়ী আমাদের কাছে অনেক কিছু আবশ্যিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে, তাঁর ইচ্ছা বা ক্বাদরের ক্ষেত্রে মানবীয় যুক্তি বা যৌক্তিক আবশ্যকতাগুলো প্রযোজ্য নয়।

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, দৃশ্যমান ও গায়িবের জগৎ—ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউতে এমন প্রতিটি দিক বিদ্যমান, যা মানবপ্রকৃতিকে অনুরণিত করে। মানুষের চিন্তা কিংবা দৃষ্টি অদৃশ্যজগতের নাগাল পায় না। ধরাছোঁয়ার বাইরের এই জগৎ মানুষের মধ্যে মহান স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের অনুভূতি তৈরি করে। অন্যদিকে দৃশ্যমান জগতে মানুষ পায় তার আকাঙ্ক্ষার খোরাকি। এ জগতে সে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে। মানুষের মধ্যে তার নিজের মূল্য এবং সম্মানিত অবস্থানের উপলব্ধি তৈরি করে এ জগৎ। এভাবে মানুষ খুঁজে পায় ভারসাম্য।

মহান আল্লাহর ক্বাদর চূড়ান্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কিছু স্থিতিশীল নিয়ম আছে, যা মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ভারসাম্যের আরেকটি দিক। মহান আল্লাহ যা ইচ্ছে, তা করেন। যখন ইচ্ছে, তখনই করেন। তাঁর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তাঁকে বাঁধা দেওয়ার মতো নেই কেউ। তবে এটাও সত্য যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছার এমন কিছু রীতি আছে, যেগুলোর কার্যকরণ আমাদের কাছে স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান এগুলোকে বলে মহাবিশ্ব বা প্রকৃতির নিয়ম। মুমিন এগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং এগুলোর সাপেক্ষে পরিচালিত করতে পারে জীবন ও সমাজকে। তবে পুরো সময়টা তার চিন্তা ও অনুভূতিতে এই উপলব্ধি দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকে—মহান আল্লাহর ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন,- তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি যেকোনো কিছু করতে সক্ষম। আল্লাহ বলেছেন,

আমি কোনোকিছুর ইচ্ছে করলে সে বিষয়ে আমার কথা তো শুধু এই যে, আমি বলি, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৪০)

যাকারিয়া বললেন, 'হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কীভাবে? আমার তো বার্ধক্য এসে গিয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।'

তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘এভাবেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সম্পন্ন করে থাকেন।’ (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৪০)

মারইয়াম বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক-! কীভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি।’ তিনি বললেন, ‘এভাবেই’, আল্লাহ যা ইচ্ছে, সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৪৭)

…আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়ানো ছিলেন, অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন। অতঃপর আমরা তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়া’কূবের সুসংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, ‘হায়, কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার!’ তারা বলল, ‘আল্লাহর কাজে আপনি বিস্ময় বোধ করছেন? হে নবি পরিবার!- আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি তো প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত সম্মানিত।’ (সূরা হূদ, ১১ : ৭১-৭২)

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, ‘হও’, ফলে তিনি হয়ে যান। (এটা) আপনার রবের নিকট থেকে সত্য, কাজেই আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৫৯-৬০)

আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে (প্রেরণ করবেন, তিনি বলবেন,) ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেবো; ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ করো, তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।’ (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৪৯)

অথবা সে ব্যক্তির মতো, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করেছিল, যা তার ছাদের ওপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, ‘মৃত্যুর পর কীভাবে আল্লাহ একে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ তাকে শত বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, ‘তুমি কতকাল অবস্থান করলে?’ সে বলল, ‘একদিন বা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি।’ তিনি বললেন, ‘বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর দিকে লক্ষ করো, সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং লক্ষ করো তোমার গাধাটির দিকে। যাতে আমরা তোমাকে বানাব মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। আর অস্থিগুলোর দিকে লক্ষ করো; কীভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দিই।’ অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হলো, তখন সে বলল, ‘আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’ (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৯)

তারা বলল, ‘তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।’

আমি বললাম, ‘হে আগুন-! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।’ (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৬৮-৭০)

যখন দুদল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, ‘আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম।’ মূসা বললেন, ‘কক্ষনো নয়, আমার রব আমার সঙ্গে আছেন, শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। অতঃপর আমরা মূসার প্রতি ওহি করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল। (সূরা শুআরা, ২৬ : ৬১-৬৩)

আপনি জানেন না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় করে দেবেন। (সূরা তালাক, ৬৫ : ১)

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান, তা-ই করেন। তিনি চেয়েছেন বলেই সৃষ্টিজগতের মধ্যে এমন কিছু নিয়ম দান করেছেন, যেগুলো মানতে মানুষ বাধ্য। কিন্তু মহান আল্লাহ নিজে এই নিয়মগুলো দ্বারা আবদ্ধ নন। চাইলে তিনি এই নিয়ম রহিত করতে পারেন, বদলে দিতে পারেন, ঘটাতে পারেন নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু। মহান আল্লাহ সব নিয়মের উর্ধ্বে। তিনি নিয়ম তৈরি করেন, নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হন না। তিনি চিরন্তন ও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী।

এ কারণেই মহাবিশ্বের মধ্যে বিরাজমান নানা নিয়ম ও প্রক্রিয়ার প্রতি আল্লাহ আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন বারবার। কুরআনে এগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে মহাবিশ্ব এবং এর ব্যবস্থাপনার ওপর মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ হিসেবে। একদিকে এগুলো সৃষ্টির মাঝে থাকা আল্লাহর নিদর্শন, অন্যদিকে এ নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলো বোঝা মানুষের জন্য উপকারী। কারণ এ বিধানগুলোকে সাধ্যমতো বোঝার পর, মানুষ নিজের জীবনের ক্ষেত্রে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

ইবরাহীম বললেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান। তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো। ফলে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল...(সূরা বাকারা, ২ : ২৫৮)

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪০)

যারা অতীত হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আর আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনোই কোনো পরিবর্তন পাবেন না। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬২)

তোমাদের পূর্বেও অনেক সম্প্রদায় ও তাদের রীতিনীতি গত হয়েছে, অতএব তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো; দেখো, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছিল। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৬৭)

এটাও কি তাদেরকে সত্য পথ দেখায় না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানব বংশ ধ্বংস করেছি, যাদের বাসভূমির ওপর দিয়ে তারা (এখন) চলাফেরা করে? এতে অবশ্যই (আল্লাহর) নিদর্শন আছে, তবুও কি তারা শুনবে না? (সূরা সাজদা, ৩২ : ২৬)

> আর আমরা তো আপনার আগে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন; অতঃপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা। (সূরা রূম, ৩০ : ৪৭)

> আর অবশ্যই আমরা তোমাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুম করেছিল। আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১৩)

> জনপদগুলোর লোকেরা যদি ঈমান আনত আর তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান আর জমিনের কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করল। কাজেই তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (সূরাআ'রাফ, ৭ : ৯৬)

ইসলাম মানুষকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখায়। প্রথমত, মহান আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কোনো নিয়ম কিংবা মানবীয় কোনো যুক্তি দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন। তিনি যা চান, তা-ই করতে পারেন এবং তিনি যা ইচ্ছা, করেন। একইসাথে ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয়—,–মহান আল্লাহর কিছু স্বাভাবিক রীতি আছে, যেগুলোকে মহাবিশ্বের সর্বজনীন নিয়মও বলা যেতে পারে। এই দুই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের বিবেক ও চিন্তার ভিত্তি মজবুত হয়। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবনের নিয়মগুলো আবিষ্কার করতে পারে মানুষ। ~~মানুষ~~ পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারে, খুঁজে পেতে পারে সৃষ্টির বুকে লুকিয়ে থাকা নানা সম্পদ। এভাবে সে ~~মানুষ~~ তার পথ, গন্তব্য এবং পুরস্কার সম্পর্কে জানতে পারে। একই সাথে তার সত্তা কামনা করে মহান আল্লাহর নৈকট্য। তার অন্তর সবসময় মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার কথা ভাবে। মহান আল্লাহর জন্য কিছুই অসাধ্য নয়, কোনোকিছুই অসম্ভব নয়—এই উপলব্ধি তার মধ্যে কার্যকর থাকে সবসময়। যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক, প্রেক্ষাপট যত দুরূহ হোক, তা মুসলিমকে হতাশ করে না, ভেঙে ফেলে না। সে জানে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। তার শক্তি, উদ্যম আর আশা ফুরিয়ে যায় না। উদগ্রীব হয়ে সে নতুনের জন্য অপেক্ষা করে, এগিয়ে যায় সামনে।

মহাবিশ্বে সক্রিয় থাকা আইন ও প্রক্রিয়াগুলো মুমিন পর্যবেক্ষণ করে। সেগুলোর সাপেক্ষে সে কাজ করে, যেমনটা তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই নিয়ম বা সেগুলো কাজে লাগাতে পারাকে এক মুহূর্তের জন্যও সে সাফল্যের প্রকৃত কারণ মনে করে না। এক মুহূর্তের জন্যও সে ভাবে না যে, এগুলোর কারণেই ফলাফল আসছে। এগুলো গন্তব্যে পৌঁছানোর মাধ্যম কেবল। আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সাধ্যমতো আসবাব গ্রহণের পর, প্রত্যেক বিষয়ের ফায়সালা মুমিন ন্যস্ত করে রাব্বুল আলামীনের ওপর। সে জানে, কার্যকারণের পর্দার পেছনে সব সাফল্য এক আল্লাহর সাথেই যুক্ত।

কাজেই একজন মুসলিম প্রাকৃতিক নিয়মের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য থেকে উপকৃত হয়। প্রকৃতির নিয়মগুলো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা আবিষ্কার করা ও বোঝা সম্ভব। এর মাধ্যমে কাজে লাগানো যায় মহাবিশ্বের মাঝে থাকা রহস্য, সম্পদ এবং শক্তিগুলোকে। গবেষণা, পরীক্ষা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে মুমিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। তবে তার হৃদয় সর্বদা মহান আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকে। তার হৃদয়ে জাগ্রত থাকে প্রগাঢ় নৈতিকতার বোধ। ফলে তার জীবন হয়ে ওঠে বরকতময় ও

বিশুদ্ধ। সীমিত মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে যতটুকু উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব, তার দিকে সে এগিয়ে যায়।

দর্শনে একটা বিখ্যাত সমস্যা আছে, স্বাধীন ইচ্ছা বনাম নিয়তির প্রশ্ন। দর্শনের আগে বিভিন্ন ধর্ম এবং পুরাণেও এ সমস্যা আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে সমস্যাটা এরকম :

> সবকিছু যদি পূর্ব নির্ধারিত হয়, তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কি আসলে কিছু থাকতে পারে?

ইসলাম আমাদের জানায়, মহান আল্লাহর ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং প্রকৃত অর্থে আল্লাহই সক্রিয় কর্তা। কিন্তু একই সাথে ইসলাম মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার থাকার কথা বলে। মহান আল্লাহর খলীফা হিসেবে মহাবিশ্বে মানুষকে একটি কেন্দ্রীয় ও বিশিষ্ট অবস্থান দান করা হয়েছে। তাকে দেওয়া হয়েছে কাজের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। এ সবকিছু তাকদীরের সাথে পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। আমরা বলেছিলাম, আপাত কার্যকরণের পর্দার আড়ালে মূল সক্রিয় কর্তা হলেন আল্লাহ। মানুষের সিদ্ধান্ত এবং কাজ এই আপাত কার্যকরণেরই অংশ। আরেকটু গভীরে গেলে আমরা দেখতে পাই, মানুষের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে কাজ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা, কোনোকিছু করার সক্ষমতা—সবই মহান আল্লাহর ক্বাদরের কারণে সম্ভব হয়। আল্লাহ বলেছেন,

> জমিনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয়ই আসে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা খুব সহজ। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২)

> বলুন, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাছাড়া অন্য কিছুই আমাদের সাথে ঘটবে না, তিনিই আমাদের রক্ষক, আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা দরকার।' (সূরা তাওবা, ৯ : ৫১)

> যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয়, তবে তারা বলে, 'এটা আল্লাহর কাছ থেকে।' আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তবে তারা বলে, 'এটা আপনার কাছ থেকে।' বলুন, 'সবকিছুই আল্লাহর কাছ থেকে।' এ সম্প্রদায়ের কী হলো যে, এরা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না! (সূরা নিসা, ৪ : ৭৮)

> বলুন, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো...(সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৫৪)

> তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান করো...(সূরা নিসা, ৪ : ৭৮)

> ...নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে...(সূরা রা'দ, ১৩ : ১১)

> এটা এজন্য যে, যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে নিয়ামাত দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (সূরা আনফাল, ৮ : ৫৩)

বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যদিও সে নানান অজুহাত পেশ করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৪-১৫)

শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর! অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজ নফসকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে। (সূরা শামস, ৯১ : ৭-১০)

এবং যে ব্যক্তি কোনো পাপকাজ করে, সে নিজের বিরুদ্ধেই তা করে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা, ৪ : ১১১)

কুরআনে আমরা আরও পড়ি,

নিশ্চয় এ কুরআন তো সকলের জন্য উপদেশবাণী। অতএব যার ইচ্ছে, সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না; তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী। (সূরা মুদাসসির, ৭৪ : ৫৪-৫৬)

নিশ্চয় এটি উপদেশ; অতএব যে চায়, সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে। আর আল্লাহ ইচ্ছা না করলে, তোমরা ইচ্ছা করবে না; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ২৯-৩০)

কী ব্যাপার! যখন তোমাদের ওপর মুসীবত এল (উহুদের যুদ্ধে) তখন তোমরা বললে, 'এটা কোত্থেকে এল?' অথচ তোমরা তো (তোমাদের শত্রুদের) দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে (বদরের যুদ্ধে)। বলুন, 'এটা তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে।' নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর যেদিন দুদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহরই হুকুমে; যাতে তিনি প্রকাশ করেন, কে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৬৫-১৬৬)

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, ইসলামে 'তাকদীর'-এর ধারণা আসলে কতটা ব্যাপক। এ আয়াতগুলো ওই বিস্তৃত ক্ষেত্রকে তুলে ধরে, যার সীমানার ভেতর মানুষকে সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই ক্ষেত্র তাকদীরের নির্ধারিত সীমার ভেতরেই কার্যকর থাকে।

তাকদীর এবং মানুষের ইচ্ছার মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে যুগে যুগে বহু দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিভ্রান্ত হয়েছে। হারিয়ে গেছে চিন্তা আর অনুমানের গোলকধাঁধায়। এমনকি এই বিষয়টি নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে অনেক দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদও বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাদের বিভ্রান্তির কারণ হলো—ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণের বদলে এ ক্ষেত্রে তারা অনুসরণ করেছেন গ্রীক দর্শনের পদ্ধতি।

এই সমস্যা, যা নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা তর্ক করে যাচ্ছেন, হাজার হাজার বছর ধরে যা তাদের বিভ্রান্ত এবং ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে—সঠিক ইসলামি আকীদার অবস্থান থেকে দেখা হলে তা আসলে কোনো সমস্যাই নয়। মহান আল্লাহ যা চান, তা-ই করেন। যাকে চান অস্তিত্বে আনেন। যেমন চান, তৈরি করেন তেমনি পরিস্থিতি। সৃষ্টির মাঝে যেকোনো

পরিবর্তন, যেকোনো নতুন ঘটনা সম্পন্ন হয় তাঁর ক্বাদর অনুযায়ী। তার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী।

> ...নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে...(সূরা রা'দ, ১৩ : ১১)

ঘটনা, বস্তু, প্রাণী—সবকিছুর সূচনা হয় ক্বাদরের মাধ্যমে। মহান আল্লাহর ক্বাদর মানবজীবনের ব্যবস্থাপনা করে, একে নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান অন্য সব সৃষ্টির মতোই। সবকিছু সৃষ্ট এক নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী, সব গতি তাকদীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে মানুষের যেহেতু সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার আছে, তাই ক্বাদর মানুষের মাঝে কার্যকর থাকে তার নিজের সিদ্ধান্ত, কাজ এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে।[1]

শেষ পর্যন্ত সবকিছুর চূড়ান্ত কর্তা মহান আল্লাহ তাআলা। একথার সাথে আগের কথার কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। কুরআনের যে আয়াতগুলো একটু আগে আমরা দেখলাম, তার মধ্যে বেশ কিছু আয়াতে মানুষের ইচ্ছা এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছাকে একই বাক্যে আনা হয়েছে। আমরা যদি মানুষের সীমিত বুদ্ধিমত্তা এবং ধ্যানধারণার আলোকে তাকদীরের সাথে মানুষের কর্মের সম্পর্ককে বুঝতে চাই, তাহলে ধরে নিতে হবে— এখানে একটা প্যারাডক্স আছে, বৈপরীত্যও আছে।

কিন্তু এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ এই ধরনের বিষয়গুলো মহান আল্লাহর যাত, সিফাত এবং ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আর মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো মানুষের তৈরি যুক্তির কাঠামো আর শ্রেণিবিভাগ দিয়ে বোঝা কিংবা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে তাই কুরআন থেকে পাওয়া জ্ঞানের আলোকে চিন্তার নতুন এক ধারা গঠন করতে হবে। কারণ ওহি ছাড়া এই বিষয়ে জ্ঞানের আর কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস আমাদের হাতে নেই। অনুমাননির্ভর চিন্তা এখানে আমাদের পথ দেখাতে পারবে না। আল্লাহ বলেছেন,

> অতএব যে চায়, সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ২৯)

তারপর তিনি বলেছেন,

> আল্লাহ ইচ্ছা না করলে, তোমরা ইচ্ছা করতে পারবে না। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৩০)

এবং তিনি বলেছেন,

> বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যদিও সে নানান অজুহাত পেশ করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৪-১৫)

> আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখাতে চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সংকীর্ণ-সংকুচিত করে দেন, (তার জন্য ইসলাম মান্য করা এমনই কঠিন) যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। যারা ঈমান আনে না, তাদের ওপর আল্লাহ এভাবে লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। (সূরা আনআম, ৬ : ১২৫)

এবং তিনি বলেছেন,

> আর আপনার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুমকারী নন। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৬)

আমরা জানি, মহান আল্লাহর ক্বাদর সামগ্রিক। একই সাথে আমরা জানি, মহান আল্লাহ মানুষের মাঝে বিচার করবেন ইনসাফের সাথে, তিনি মানুষকে কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। এ দুয়ের মধ্যে একজন মুসলিম কীভাবে সমন্বয় করবে?

সমন্বয়ের একমাত্র উপায় হলো এটা ধরে নেওয়া যে, মহান আল্লাহ মানুষের ইচ্ছাকে সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ তার কর্ম এবং সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সে তার কাজ এবং সিদ্ধান্তের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত অথবা পুরস্কৃত হবে। কিন্তু মানুষের এই সীমিত এখতিয়ার কখনো তাকদীরের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

প্রশ্ন আসতে পারে, এটা কীভাবে সম্ভব?

এই 'কীভাবে'-এর উত্তর আছে শুধু মহান আল্লাহর কাছে। এই 'কীভাবে'-এর ব্যাখ্যা পুরোপুরিভাবে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। এই প্রশ্নের সম্পর্ক মহান আল্লাহর ইচ্ছা আর সেই ইচ্ছা সংঘটিত হওয়ার সাথে। তাই এ কীভাবে-এর উত্তর বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ বলে, এই বিষয়গুলোকে তাঁর কাছেই ছেড়ে দিতে হবে, যিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং পরিকল্পনায় সর্বশক্তিমান। তাঁর ইনসাফ, হিকমাহ, নিয়ামাত ও রাহমাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

মানুষের বুদ্ধি বা যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা স্থান ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ। মানুষের এই ক্ষমতাগুলো প্রভাবিত হয় পারিপার্শ্বিকতা, মানসিক গঠন ও বেড়ে ওঠা দ্বারা। মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে 'কীভাবে'-এর কোনো উত্তর, কোনো ব্যাখ্যা বোঝা সীমিত বুদ্ধির মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাকদীর এবং মানুষের কর্মের মধ্যে কী সম্পর্ক, কী যোগাযোগ;- তা বিচার করা মানুষের কাজ নয়।

এই সবকিছু তাকে ছেড়ে দিতে হবে মহান আল্লাহর জন্য;+ যিনি মানুষের প্রকৃতি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কে জানেন, মানুষের সক্ষমতা সম্পর্কে জানেন। তিনি জানেন তাঁর ক্বাদরের অধীনস্থ হয়ে মানুষ কতটুকু করতে পারে, কী করতে পারে।÷ তাই তাঁর কাছেই আমাদের বিষয়গুলো ছেড়ে দেওয়া উচিত। শুধু এভাবেই আমাদের পক্ষে চিন্তা এবং অনুধাবনের সঠিক ভারসাম্য অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে আমরা মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে আত্মবিশ্বাসী হতে পারব। অর্জন করতে পারব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আরেকটি সমস্যা আছে, যা নিয়ে শত শত বছর ধরে দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকরা আলোচনা করেছেন। একে বলা হয় The problem of evil and suffering (পৃথিবীতে মন্দ ও দুঃখদুর্দশার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন)। এ সমস্যাকে প্রায়ই এভাবে উপস্থাপন করা হয় :

> স্রষ্টা যদি পরম করুণাময়, পবিত্র ও কল্যাণময় হন, তাহলে পৃথিবীতে কেন এত মন্দ, কেন এত কষ্ট? কেন ভালো মানুষের সাথে খারাপ জিনিস ঘটে? কেন খারাপ মানুষরা দুনিয়াতে সুখে থাকে?

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের জায়গা থেকে এটাও তেমন কোনো সমস্যা নয়। ইসলামের মৌলিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা হলো—এই

পৃথিবী পরীক্ষা এবং কাজের ক্ষেত্র আর আখিরাত হলো জবাবদিহিতা এবং প্রতিদানের জন্য। পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান স্বল্প সময়ের, এ জীবন দীর্ঘ এক সফরের ছোট্ট অংশ কেবল। দুনিয়ার এ জীবনই শেষ কথা নয়। সব হিসেবনিকেশ পৃথিবীর এই জীবনে শেষ হয় না, বরং এ জীবনের সমাপ্তি হলো পরের জীবনের সূচনা। মানুষের সত্যিকারের জীবন হলো আখিরাতের জীবন। আর বিচারের দিন মানুষের অবস্থান এবং মর্যাদা ঠিক করা হবে পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কাজের ভিত্তিতে। ইসলামের এই ব্যাখ্যা মানুষকে সন্তুষ্ট করে।

এভাবে ইসলাম এই সমস্যার আবেগী দিকটার সমাধান করে। এই ব্যাখ্যা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী এবং অবিচল রাখে। দুনিয়াতে অনেক ভালো মানুষের সাথে অনেক খারাপ কিছু ঘটে, সত্য। কিন্তু এই দুনিয়া তো জীবনের সম্পূর্ণতা নয়। দুনিয়া হলো জীবন নামক সমীকরণের একটা দিক কেবল। এই সমীকরণের আরও একটি দিক আছে। আর এই সমীকরণের দুই দিককে নিয়ন্ত্রণ করেন একই সত্তা। এক মহান বিচারক; যার জ্ঞান সর্বব্যাপী, যিনি বিচার করেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে।

ইসলামের শিক্ষা নাড়া দেয় মানুষের বিবেকের গভীরতম পর্যায়গুলোকেও। যে মুসলিম ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মেনে চলার এবং সমাজে সামগ্রিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে, আখিরাতের প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাবার আগেও মালিকের প্রতি সে থাকে সন্তুষ্ট। মন্দের কারণে দুনিয়াতে কষ্টের মুখোমুখি হতে হলেও সে খুশি থাকে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে কাজ করছে এবং মহান আল্লাহ তার এই কাজে খুশি—এই উপলব্ধিই তার সন্তুষ্টি ও আনন্দের উৎস।

মন্দ ও বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়াকে মানুষ উপভোগ করে। মহান আল্লাহ এভাবেই মানুষকে তৈরি করেছেন। এই সহজাত উপলব্ধি মানুষকে করে আত্মবিশ্বাসী ও প্রশান্ত। কুরআনে এসেছে,

> …তারাই ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়। (সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮)

> ইসলামের জন্য আল্লাহ যার বক্ষ উন্মোচিত করে দিয়েছেন, যার ফলে সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোর ওপর রয়েছে (সে কি তার সমান, যে কঠোর হৃদয়ের)? অতএব দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ২২)

> যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর (সে কথার ওপর) সুদৃঢ় থাকে;- ফেরেশতারা তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় আর বলে, 'তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না, আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে, যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে, যা তোমরা দাবি করবে।' পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০-৩২)

> তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৩৯)

> তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষা করছো, তা দুটো ভালোর (শাহাদাত কিংবা বিজয়) একটি ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন সরাসরি নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তাওবা, ৯ : ৫২)

মানুষ প্রশ্ন করে—কেন মন্দের অস্তিত্ব আছে? মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। মহান আল্লাহ কেন দুনিয়াতে মন্দকে রাখলেন? তিনি চাইলে সব ধরনের মন্দ জিনিসকে জীবন থেকে একেবারে বাদ দিতে পারতেন। তিনি সব মানুষকে হিদায়াত করতে পারতেন অথবা মানুষকে এমনভাবে তৈরি করতে পারতেন যে, শুরু থেকে সবাই হিদায়াতের ওপর থাকবে এবং এ থেকে বিচ্যুত হবে না। কেন তিনি এমন করলেন না?

ইসলামে এ ধরনের প্রশ্নের কোনো স্থান নেই। মহান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিকে যেকোনোভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম, একথা সত্য। তিনি চাইলে মানুষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো প্রকৃতিতেও তৈরি করতে পারতেন, পারেন। কিন্তু তিনি চেয়েছেন মানুষকে এভাবে তৈরি করতে, তিনি চেয়েছেন মহাবিশ্বকে এভাবে তৈরি করতে। এটাই তাঁর ইচ্ছা, এতেই তিনি সন্তুষ্ট।

মহান আল্লাহর কী করা উচিত, তিনি কী করলে ভালো হতো—সৃষ্টির কী অধিকার আছে তা বলে দেওয়ার? মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও ব্যবস্থাকে বোঝার সক্ষমতা যার নেই, সমগ্র প্রাণিজগৎ ও প্রকৃতি, সব ব্যক্তির চাহিদা এবং প্রয়োজনকে যে বুঝতে পারে না, যে জানে না কেন বিভিন্ন প্রাণীকে তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো; সেই সীমিত প্রাণীর কী অধিকার আছে মহান আল্লাহর কী করা উচিত, তা বলার?

কী করা উচিত, কী করা ভালো—আল্লাহ এবং কেবল আল্লাহই তা জানেন। তিনিই ঠিক করেন কোন জিনিসের বৈশিষ্ট্য কী হবে, কার প্রকৃতি কেমন হবে, কোনটার রূপ কী হবে এবং সামগ্রিকভাবে এই মহাবিশ্ব কেমন হবে। তিনি জানেন কেমন হওয়া উচিত। তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, আর কেউ নয়।

> সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়! (সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১৪)

> মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি সকল (সৃষ্ট) বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।' (সূরা ত্বহা, ২০ : ৫০)

> আর আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে এক উম্মাত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৮)

> আর আল্লাহ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫১)

> প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই

তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩৫)

কেন এমন হলো—এই প্রশ্নটা সত্যিকারের কোনো বিশ্বাসী অথবা সিরিয়াস কোনো নাস্তিক কখনো তোলে না। সত্যিকারের বিশ্বাসী এই প্রশ্ন করে না, কারণ মহান আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে সে কিছুটা হলেও ধারণা রাখে। মহান আল্লাহকে সে শ্রদ্ধা করে। ইসলামের শিক্ষা থেকে সে মহান আল্লাহর বড়ত্ব এবং তাঁর সিফাত সম্পর্কে জেনেছে। সে খুব ভালোমতো জানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা কোনোভাবেই এই বিষয়গুলো পুরোপুরিভাবে বুঝতে বা ধারণ করতে সক্ষম নয়। তাই এই ধরনের প্রশ্ন তোলার চিন্তাকেও সে সমীচীন মনে করে না। অন্যদিকে একজন সিরিয়াস নাস্তিকও এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কারণ সে তো স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসই করে না। যদি সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা শুরু করে, তাহলে জানবে—,–এধরনের সব বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধু স্রষ্টারই আছে এবং তিনি যা বেছে নেন, তা-ই চূড়ান্ত।

আসলে এই ধরনের প্রশ্ন করে একগুঁয়ে, জেদি, মাথামোটা, বিবাদপ্রবণ মানুষ। অথবা ওই ধরনের মানুষ, যারা এ ধরনের বিষয় নিয়ে হালকাচালে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করে। এমন লোকের প্রশ্নের উত্তর যুক্তি-তর্ক দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অর্থহীন। কারণ এই প্রশ্নটা এমন এক বাস্তবতার ব্যাপারে করা হচ্ছে, যা যুক্তির নাগালের বাইরে। এমন এক বাস্তবতা, যা মানবীয় বুদ্ধিমত্তার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই 'কেন'-এর উত্তর জানতে হলে মানুষকে ঈশ্বর হতে হবে। কিন্তু মানুষ তো কখনো ঈশ্বর হতে পারবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে একমাত্র করণীয় হলো —এই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া এবং এই বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু গ্রহণ করে নেওয়া।

মানুষের মধ্যে বিভিন্ন নেতিবাচক তাড়না কাজ করে। এগুলো মানুষকে মন্দ, বাতিল, গোমরাহি আর গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, মানুষের ওপর এই তাড়নাগুলোর প্রভাব থাকলেও পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব থাকে না। ইবলীস মানুষকে প্রলুব্ধ করে, মন্দ কাজে উসকানি দেয়, ভুলের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু ইবলীস মানুষের ওপরে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। সে কেবল মানুষকে প্রলুব্ধ করতে পারে, তামানুষকে দিয়ে জোর করে সে কিছু করাতে পারে না। সিদ্ধান্ত মানুষের। শয়তানের বিরুদ্ধে সংঘাতের শক্তিশালী বর্ম হলো ঈমান এবং আল্লাহর কাছেছ থেকে নিরাপত্তা ও সাহায্য চাওয়া।

> সে বলল, 'হে আমার রব!, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই জমিনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয় তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।' তবে তাদের মধ্যে আপনার একান্ত বান্দাগণ ছাড়া। আল্লাহ বললেন, '(আমার বাছাই করা বান্দারা যে পথে চলছে) এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল সোজা পথ। নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া; যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে।' (সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ৩৯-৪২)
>
> তিনি বললেন, 'তোমরা দুজনে (আদম ও ইবলীস) একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর- পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ এলে যে আমার প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।' সে বলবে, 'হে আমার রব!, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় ওঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন?' তিনি বলবেন, 'এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলি

এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো।' (সূরা ত্বহা, ২০ : ১২৩-১২৬)

আর যখন বিচারের কাজ সম্পন্ন হবে, তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের ওপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডাকছিলাম আর তাতে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরই তিরস্কার করো। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা যে আগে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২২)

সুতরাং যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই ওপর নির্ভর করে, তাদের ওপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের ওপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৯৮-১০০)

...নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৬)

আরেকটি প্রশ্ন আছে, যা অনেকেই তুলে থাকেন। সেই প্রশ্নটা হলো :

যেহেতু আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা এবং সক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেছেন, তার মধ্যে হিদায়াত অথবা বাতিলের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ কীভাবে দুনিয়া অথবা আখিরাতে গুনাহগার বা মন্দ ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন? অথবা নেককার বা ভালো ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করতে পারেন?

আসলে এভাবে যখন উপস্থাপন করা হয়, তখন এই প্রশ্নটা বিভ্রান্তি তৈরি করে। তবে কুরআনের বক্তব্য দিয়ে এ বিভ্রান্তির জবাব দেওয়া যায় সহজেই। কুরআন আমাদের জানায়—আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম রূপে। কিন্তু মানুষ যখন মহান আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন সে তার মর্যাদার অবস্থানও হারিয়ে ফেলে। ভালো এবং মন্দ দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার, বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। আর যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ বলেছেন,

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তো আছে অফুরন্ত প্রতিদান। (সূরা তীন, ৯৫ : ৪-৬)

শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর! অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজ নফসকে পবিত্র করেছে। সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজ নফসকে কলুষিত করেছে। (সূরা শামস, ৯১ : ৭-১০)

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব। ফলে আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি—,–হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে হবে অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ২-৩)

নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে এবং যা উত্তম, তা সত্য বলে গ্রহণ করে;- আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেবো। আর যে কার্পণ্য করে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, আর যা উত্তম, তা অমান্য করে;- আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দেবো। (সূরা লাইল, ৯২ : ৪-১০)

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৯)

কাজেই এ বিষয়টিও ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোকাবিলা করে। প্রত্যেক মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়। মানবীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাকদীর কার্যকর হয় মানুষের এই সিদ্ধান্ত, কাজ এবং পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে।

একই সাথে ইসলাম আমাদের শেখায়, মহান আল্লাহ মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন এবং কিছু জিনিসকে আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। এই দায়িত্ব ও নিষেধগুলো স্পষ্ট। এখানে বিশেষ কোনো রহস্য বা অজানা কিছু নেই। মহান আল্লাহ এই বিষয়গুলো নিয়েই মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এগুলোর ব্যাপারে হিসেব নেবেন। কিন্তু যে বিষয়গুলো গায়িবের সাথে সংযুক্ত, মানুষের বোধশক্তির নাগালের বাইরে, যেগুলো জানা-, বোঝা, -উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; যেমন তাকদীর, সেগুলো নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে প্রশ্ন করবেন না। এগুলোর ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে না আমাদের। এই বিষয়গুলো অনুসন্ধানের দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকে দেননি। এগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ আমাদের কিছুই করতে বলেননি। শুধু বলেছেন, মানুষ যেন এতটুকু বিশ্বাস রাখে যে তাকদীরের ভালো-মন্দ, দুটোই মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত। ব্যস!

কাজেই মুসলিমের সামনে থাকা পথ স্পষ্ট ও সোজা। ফরজ দায়িত্বগুলো পালন করা, স্পষ্ট হারাম থেকে দূরে থাকা, হালাল-হারামের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা এবং এতে ব্যস্ত রাখা নিজেকে। যতটুকু সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে গিয়ে গায়িবের জগৎকে বোঝার চেষ্টা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে বুঝতে হবে। মানুষের কাজ এতটুকুই। আমরা পালন করতে পারব না, এমন কোনো দায়িত্ব মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। তিনি আমাদের এমন কিছু জানার জন্য বাধ্য করেননি, যা আমাদের বোধশক্তির বাইরে। এমন কিছু তিনি হারাম করেননি, যা থেকে দূরে থাকা অসম্ভব। আল্লাহ মানুষের ওপর সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপান না। এই কথা বিশ্বাস করা ছাড়া কারও ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন,

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভালো যা উপার্জন করে, তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে, তার প্রতিফল তার ওপরই বর্তায়... (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৬)

আর যখনই তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, ‘আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।’ বলো, ‘নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে

> এমন কিছু বলছো, যা তোমরা জানো না?' বলুন, 'আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।' আর প্রত্যেক সাজদা বা ইবাদাতে তোমাদের লক্ষ্য ও মনোযোগকে (তাঁর প্রতি) নিবদ্ধ করো, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকো। যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে, (তোমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে) সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৮-২৯)

এই শিক্ষাগুলোর মাধ্যমে বিশ্বাস এবং কাজের সঠিক ভারসাম্য আসে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের ভেতর কল্যাণের তাড়না তৈরি করে। তাকে দৃঢ় ও কার্যকরী হতে সাহায্য করে। একইসাথে মানুষকে করে স্রষ্টার অভিমুখী। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অলসতা, উদ্যমহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা আর জল্পনাকল্পনার শেকড় কেটে দেয়। বন্ধ করে দেয় নিজ দায়িত্ব ভুলে নিজের গুনাহকে তাকদীরের ওপর ন্যস্ত করার পথ।

একজন মুসলিম জানে মহান, আল্লাহ কুফর এবং সত্যের প্রত্যাখ্যান নিয়ে সন্তুষ্ট নন। বিশ্বাসীদের মধ্যে ফাহিশা এবং অশ্লীলতার প্রসার হোক, তা তিনি পছন্দ করেন না। ব্যক্তি নিজে মন্দ থেকে বিরত থাকবে; কিন্তু সমাজে মন্দের প্রতিরোধ নিয়ে ভাববে না, মানুষ সত্যকে জানবে; কিন্তু সত্যকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে না, সাধ্যমতো সমর্থন করবে না সত্যকে—এটি মহান আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক নয়। মানুষ পৃথিবীতে খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে না, এটিও মহান আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক নয়।

মুসলিম জানে, দুনিয়া হলো পরীক্ষা। ভালো এবং মন্দের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। মানুষের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, কাজ, পরিস্থিতি—একেকটা পরীক্ষা। বিচারের দিনে মানুষের হিসাব নেওয়া হবে, প্রতিদান দেওয়া হবে তার ভালো ও মন্দ কাজের। মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ খলীফা। মহাবিশ্বে তাকে সম্মানিত অবস্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে সে পুরস্কৃত হবে। আর এই দায়িত্ব যদি সে পালন না করে অথবা আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোনোভাবে সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ব্যর্থতার কারণ সাহসিকতার অভাব কিংবা দায়িত্ব এড়ানো—যাই হোক না কেন, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

একদিকে সৃষ্টিজগতে মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার অবস্থান দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হলো সে মহান আল্লাহর গোলাম। এ দুই দিকের মধ্যেও ভারসাম্য আছে। এই ভারসাম্য ইসলামকে ওই সব বিপর্যয় থেকে হেফাযত করেছে যেগুলো অন্যান্য ধর্ম, দর্শন এবং বিশ্বাসব্যবস্থাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এদের মধ্যে এক প্রান্তিকতা থেকে অন্য প্রান্তিকতায় যাবার প্রবণতা দেখা যায়। একদিকে মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপের প্রবণতা, অন্যদিকে মানুষকে পশু হিসেবে দেখানোর প্রান্তিক প্রবণতা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানান রূপে মানবজাতির সামনে এসেছে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এগুলো থেকে একেবারেই নিরাপদ।

ইসলাম মহান আল্লাহর সত্তা এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে মৌলিক এবং পরিপূর্ণ পার্থক্য করে। রবের অবস্থান আর তার গোলামদের অবস্থান, আল্লাহর সিফাত এবং তাঁর সৃষ্টির সিফাত, সবকিছুর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করে ইসলাম, যাতে এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো অস্পষ্টতা বা ভুল বোঝাবুঝি না থাকে।

'কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা,'[2]—অর্থাৎ মহান আল্লাহর যাত, সিফাতের সাথে কোনোকিছুর তুলনা চলে

না।

‘তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশিত আবার গুপ্ত, তিনি সকল বিষয় পূর্ণরূপে জ্ঞাত।,’[3]—অর্থাৎ তাঁর সত্তায় ও অস্তিত্বে আর কারও, আর কোনোকিছুর অংশীদারত্ব নেই।

‘ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবকিছুই নশ্বর; আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব;’[4]—অর্থাৎ মহান আল্লাহ চিরন্তন, চিরজীবি, আর কারও পক্ষে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

‘তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।,’[5]—অর্থাৎ সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই।

‘আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক, মহাপ্রতাপশালী।’[6]—অর্থাৎ তিনিই স্রষ্টা। সৃষ্টিতে আর কারও অংশীদারত্ব নেই।

‘আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে, রিয্ক প্রশস্ত করেন আর সীমিত করেন’[7]—অর্থাৎ আল্লাহই রিয্কদাতা, এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক নেই।

‘আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।,’[8]—অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ। এ জ্ঞান কেবলই তাঁর।

‘এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই’,’[9]—অর্থাৎ মহান আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের সাথে কোনোকিছুর তুলনা হতে পারে না।

‘তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধিবিধান দিয়েছে; যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’[10]—অর্থাৎ বিধানদাতা শুধু আল্লাহই, এখানে তাঁর কোনো শরীক নেই।

মহান আল্লাহর সবগুলো বৈশিষ্ট্য এভাবে অনন্য। অন্যদিকে, বাকি সব সৃষ্টির মতো মানুষও মহান আল্লাহর গোলাম। মহান আল্লাহর যাত ও সিফাতে মানুষের কোনো অংশীদারত্ব নেই। খ্রিষ্টানদের অনেকে বলে, ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃতি ছিল পরিপূর্ণভাবে খোদায়ী। আবার কেউ কেউ বলে, তাঁর প্রকৃতি ছিল একই সাথে খোদায়ী এবং মানবীয়। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কিন্তু এ সবগুলো অবস্থানই ভুল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> মারইয়াম-পুত্র তো শুধু একজন বান্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৯)
>
> মসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না। আর কেউ তাঁর (আল্লাহর) ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১৭২)
>
> আসমানসমূহ ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৩)

মানুষ আল্লাহর দাস। কিন্তু এই দাসত্ব দ্বারা মানুষকে সম্মানিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের মাঝে রূহ সঞ্চার করেছেন।[11] অন্য সব সৃষ্টির ওপর সম্মানিত করেছেন মানুষকে। এমনকি মহান আল্লাহ তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত মালাইকাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন আদম (আলাইহিসসালাম)-কে সাজদা করে।

> স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে'। অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হয়ো।'; অতঃপর, ফেরেশতারা সকলেই সাজদা করল; ইবলীস ছাড়া।; সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ২৮-৩১)

মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর খলীফা। এই পৃথিবীর সবকিছুর ওপরে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।[12] মহাবিশ্বের বিন্যাসে এটাই মানুষের নির্ধারিত ভূমিকা, যা মানুষের জন্য নির্ধারিত ছিল সে অস্তিত্বে আসার আগেই।

> আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি জমিনে খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরা আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না।' তারপর তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম!; তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন।' অতঃপর তিনি (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান ও জমিনের গায়িব জানি। আরও জানি, যা তোমরা ব্যক্ত করো এবং যা তোমরা গোপন করে রাখো। (সূরা বাকারা, ২ : ৩০-৩৩)

> আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত কিছু।; নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৩)

> আর জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে জমিন তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদনদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ১৫)

> আপনি কি দেখতে পান না যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তিনি তোমাদের কল্যাণ-কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। আর নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে তাঁর হুকুমেই? তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তা পৃথিবীতে পতিত না হয় তাঁর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ মানুষের প্রতি নিশ্চিতই বড়ই করুণাশীল, বড়ই দয়াবান। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫)

মানুষ যখন অন্য সবকিছুর দাসত্ব থেকে বের হয়ে কেবল আল্লাহর দাসত্ব করে, তখনই সে সত্যিকার অর্থে মুক্ত হয়। নিজেকে পুরোপুরিভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃতির সাথে পরিপূর্ণ ভারসাম্যে আসে। সে অর্জন করে

বাকি সব সৃষ্টি ও মহাবিশ্বের সাথে ভারসাম্য। আর মানবীয় উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত হলেন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

> আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫ : ৫৬)

ইসলাম মানুষকে মর্যাদা দেয়। আর এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান মানুষকে অন্য সৃষ্টির গোলামি করা থেকে রক্ষা করে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত না করতে শেখায়। এভাবে সংরক্ষিত হয় মানুষের সম্মান ও মর্যাদা। একই সাথে এই উপলব্ধি মানুষকে কলুষতা এবং সীমালঙ্ঘনের দিকে নিয়ে যাওয়া অহংকার এবং ঔদ্ধত্য থেকে হেফাজত করে। ইসলাম মানুষকে অবনত করে সমগ্র সৃষ্টির মালিকের প্রতি।

সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার কোনো বৈশিষ্ট্য আরোপ করা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম। আজ অনেকে মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুমোদন ছাড়াই।- তাদেরকে যেন মানুষের জন্য আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেন তারা মানুষের ওপর সার্বভৌম কোনো শক্তি! যারা এমন কাজ করে, তারা আসলে মহান আল্লাহ পবিত্র বৈশিষ্ট্য নিজেদের জন্য দাবি করে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের মর্যাদা, তার উঁচু অবস্থান এবং তার মহত্ত্বের কথা বলে। একই সাথে ইসলাম আমাদের শেখায়, মানুষ আল্লাহ তাআলার গোলাম। কিন্তু এই দুই অবস্থান একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মানুষকে সম্মানিত করার জন্য আল্লাহর প্রতি মানুষের দাসত্বকে নাকচ করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে কাউকে সম্মানিত করার জন্য তার ওপর মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য আরোপ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। খ্রিষ্টান চার্চ, এর বিশপ ও কাউন্সিলগুলো ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিল। তারা মনে করেছিল—ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে সম্মানিত করতে হলে, উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে;- এমন করা দরকার। এটি ভুল ধারণা। কুরআনে এসেছে,

> তারা অবশ্যই কুফরি করেছে, যারা বলে, মারইয়াম পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। মাসীহ তো বলেছিল, ‘হে বনী ইসরাঈল!- তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।’ অবশ্যই তারা কুফরি করেছে, যারা বলে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন।’ অথচ এক ইলাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে। তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মাসীহ ইবনু মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন; তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন এবং তাঁর মা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠা ছিলেন। তারা দুজনেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। দেখুন, আমরা তাদের জন্য আয়াতগুলোকে কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; তারপরও দেখুন, কীভাবে তারা (সত্য হতে) বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২-৭৫)
>
> আরও স্মরণ করুন, আল্লাহ যখন বলবেন, ‘হে মারইয়াম তনয় ঈসা!- আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা

আল্লাহ ছাড়া আমাকে আর আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো?' 'তিনি বলবেন, 'আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে আপনি তো তা জানতেন। আমার অন্তরের কথা তো আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো জানেন। আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন, তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি।, তা এই যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত করো এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী; কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৬-১১৮)

মানুষকে সম্মানিত করার জন্য, তার উচ্চমর্যাদা জানান দেওয়ার জন্য, পৃথিবীর ওপর মানুষকে যে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য —মহান আল্লাহর অবস্থানকে অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করলে মানুষের সম্মান কমে না। কিন্তু আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা এমনটাই মনে করে। এ ধরনের ভ্রান্ত এবং কুৎসিত চিন্তাভাবনা ইউরোপীয়দের মধ্যে এসেছে গ্রীক পুরাণ এবং ইয়াহূদিদের ট্রাডিশন থেকে। পরে এগুলো খ্রিষ্টধর্মে ঢুকেছে আর খ্রিষ্টধর্ম থেকে এসেছে সেক্যুলার উত্তরসূরিদের মাঝে।

গ্রীক পুরাণের প্রধান দেবতার নাম যিউস। প্রমিথিউস নামের আরেক দেবতার ওপর যিউস খুব ক্ষুব্ধ ছিল। অলিম্পাস পর্বত থেকে পবিত্র আগুন চুরি করে এনে মানুষকে দিয়েছিল প্রমিথিউস। গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী পবিত্র আগুন হলো জ্ঞানের রহস্য। যিউস চাচ্ছিল না মানুষ জ্ঞান অর্জন করুক। জ্ঞান অর্জন করলে মানুষের মর্যাদা বাড়বে, কমবে যিউসসহ অন্য সব দেবতাদের মর্যাদা। একসময় মানুষ পরিণত হবে দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতে। কে জানে, একপর্যায়ে মানুষ হয়তো যিউসকে চ্যালেঞ্জ করে বসবে, ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেবে তাকে। তাই প্রমিথিউসকে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছিল যিউস।

ইয়াহূদিদের বিশ্বাসের অবস্থা দেখুন। জেনেসিস ৩ : ২২-এ আমরা দেখি, মানুষ জ্ঞানবৃক্ষ থেকে ফল খেয়ে ফেলবে, তারপর সেই ফল খেয়ে অমর হয়ে যাবে—এ নিয়ে বাইবেলের ঈশ্বর আতঙ্কিত। তাই ঈশ্বর মানুষকে স্বর্গীয় উদ্যান থেকে বের করে দিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের কাছে যেন মানুষ যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করলেন প্রহরী আর আর ঘূর্ণায়মান আগুনের তরবারি।

এই ধরনের পৌরাণিক ধ্যানধারণা গেঁথে আছে ইউরোপীয় চিন্তার একেবারে কেন্দ্রে। তাদের দর্শন, মতবাদ, চিন্তাধারা, জীবনব্যবস্থাসহ সবকিছুই ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ও চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক। অনেক ক্ষেত্রে এই সাংঘর্ষিকতা বাহ্যিকভাবে বোঝা গেলেও অন্য অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় না। কিন্তু সাংঘর্ষিকতা থাকবেই। তাই ইউরোপীয় ধ্যানধারণা, চিন্তাধারা, মতাদর্শ, মতবাদ ও জীবনব্যবস্থা—কোনোকিছু গ্রহণ করা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ও চিন্তাধারার জন্য মৌলিকভাবে ক্ষতিকর। ইউরোপীয় চিন্তা থেকে কোনোকিছু গ্রহণ করা কখনোই ইসলামের জন্য কল্যাণকর হবে না। ধার করে আনা সেই উপাদান ইসলামের শরীরে বিষের মতো কাজ করবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অবশ করে দেবে, কর্মক্ষমতা ধ্বংস করে দেবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা হলে মৃত্যুর কারণ হবে।

গোলামের অন্তরে মালিকের ব্যাপারে ভয়, শ্রদ্ধা এবং দূরত্বের অনুভূতি কাজ করে। পাশাপাশি থাকে ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির তীব্র অনুভূতি। মানুষের জীবনে এই দুটো দিকেরই নিখুঁত ভারসাম্য থাকতে হয়। একজন মুসলিম কুরআনে এমন সব আয়াতের মুখোমুখি হয়, যা তার অন্তরকে প্রকম্পিত করে, ভেঙেচুরে দেয়।

> এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁরই দিকে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৪)
>
> চোখসমূহের খিয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে, তা তিনি জানেন। (সূরা গাফির, ৪০ : ১৯)
>
> আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনির চেয়েও নিকটতর। (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ১৮)
>
> আর জেনে রাখো-, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৯)
>
> আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ আযাব দানে কঠোর। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৬)
>
> অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না। আর আমি তাদেরকে অবকাশ দেবো। অবশ্যই আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। (সূরা কলম, ৬৮ : ৪৪-৪৫)
>
> নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। (সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১২)
>
> আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৪)
>
> এরূপই আপনার রবের পাকড়াও, যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন। (সূরা হূদ, ১১ : ১০২)
>
> আর ছেড়ে দিন আমাকে ও বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন, নিশ্চয় আমার কাছে আছে শেকল আর দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন ও কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এসব শাস্তি দেওয়া হবে) যেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ১১-১৪)

বিচারের দিনের শাস্তির ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা হৃদয়কে সন্ত্রস্ত করে।[13] কিন্তু একজন মুসলিম যখন কুরআনের পাতায় মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা পড়ে, তখন তার মনে আশা জাগে, তার মনে মহান আল্লাহর নৈকট্য পাবার, তাঁকে দেখার প্রত্যাশা

তৈরি হয়। তার অন্তরে কাজ করে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা।

> আর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই... (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৬)

> বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে-? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ৬২)

> শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা, ২ : ২৬৮)

> আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, ২ : ১৪৩)

> আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা নিসা, ৪ : ২৮)

> তোমরা যদি শোকরগুজার হও এবং ঈমান আনো, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? আর আল্লাহ (শোকরের) পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪৭)

> নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৬)

> এবং তিনি ক্ষমাশীল, অতি স্নেহময়।; (সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১৪)

> আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। (সূরা বাকারা, ২ : ২০৭)

> আর যারা সৎকাজ করে সেই মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম প্রতিফল। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ২-৩)

জান্নাতের পুরস্কারের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা মানুষের হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে তোলে।[14] এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের কথা চিন্তা করার মাধ্যমে মানুষের বিবেক ভয় ও আশা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা, উৎকণ্ঠা ও সন্তুষ্টির মাঝে ভারসাম্য খুঁজে পায়। মানুষ তখন জীবনের পথে ও আখিরাতের জীবনের দিকে এগিয়ে যায় বুকভরতি আশা নিয়ে, দৃঢ় পদক্ষেপে, খোলা চোখে, উদ্দীপ্ত হৃদয়ে। ওই পথের নানা খানাখন্দের ব্যাপারে সে সতর্ক থাকে। কিন্তু পথচলা থামে না তার। ক্রমশ সে এগুতে থাকে উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে। এ ধরনের মানুষ বাস্তবতাকে তুচ্ছ করে না। দায়িত্বের ব্যাপারে গাফিল হয় না। সবসময় সে সচেতন থাকে মহান আল্লাহর ক্ষমাশীলতা ও দয়ার ব্যাপারে। সে জানে, আল্লাহ মানুষের অকল্যাণ চান না। মানুষকে ভুলের দিকে ঠেলে দিয়ে তারপর শাস্তি দিয়ে সন্তুষ্টি

খোঁজেন না তিনি। মহান আল্লাহ এ সবকিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

মহান আল্লাহর ব্যাপারে ইসলাম আমাদের যা শেখায়, তার সাথে অন্যান্য অবস্থানের তুলনা করে দেখুন। গ্রীক পুরাণের দেবরাজ যিউস হিংসুক, কামুক, ও বিদ্বেষপরায়ণ। ইয়াহূদিদের ঈশ্বর যে ঈর্ষান্বিত, অত্যাচারী, প্রতিশোধপরায়ণ এবং নিষ্ঠুর। অ্যারিস্টোটলের পরম সত্তা সৃষ্টির ব্যাপারে বেখবর, সৃষ্টির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার চিন্তা কেবল নিজেকে নিয়ে। কারণ অ্যারিস্টটলের মতে, পবিত্র সত্তার জন্য পবিত্রতম সত্তাকে নিয়ে (অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে) চিন্তা ছাড়া আর কোনোকিছুই সমীচীন নয়। অন্যদিকে বস্তুবাদীরা বলে 'প্রকৃতি' নামের এক অন্ধ, বধির, দেবতার কথা।

এ অবস্থানগুলোর সাথে কুরআন থেকে পাওয়া মহান আল্লাহর পরিচয়কে মিলিয়ে দেখুন। এভাবে তাকালে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সত্যিকারের সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও মহত্ত্ব আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণতার বৈশিষ্ট্য কিছুটা হলেও আমরা তখন বুঝতে পারব।

জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রেও ইসলামের অবস্থান ভারসাম্যপূর্ণ। ওহির মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞান এবং দুনিয়া থেকে গবেষণা, অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান—দুটোকেই ইসলাম স্বীকার করে। আমরা দেখেছি জ্ঞানের উৎস নিয়ে বিভ্রান্তির কারণে ইউরোপ কীভাবে হাজার বছর ধরে গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে ক্রমাগত। কীভাবে বারবার ছোটাছুটি করছে এক চরম অবস্থান থেকে আরেক চরম অবস্থানে। প্রথমে তারা তাদের কাছে থাকা আসমানি কিতাবের বিকৃত রূপকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারপর তারা জ্ঞানের উৎস হিসেবে নিয়েছিল কেবল বুদ্ধিমত্তাকে। তারপর কেবল ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকেই তারা জ্ঞানের উৎস হিসেবে নিয়েছিল। প্রতিটি ধাপে তাদের অবস্থান ছিল প্রান্তিক।

কিন্তু ইসলামের অবস্থান ভারসাম্যপূর্ণ, এখানে কোনো অনুরাগবিরাগ, খেয়ালখুশি, কামনাবাসনা, অজ্ঞতা বা ত্রুটি নেই। জ্ঞানের কোনো উৎসকে ইসলাম নাকচ করে না, বরং জ্ঞানের প্রতিটি উৎসকে সঠিক অবস্থানে রাখে। কোনো অবস্থানকে অতিরঞ্জিত করে না, তাচ্ছিল্যও করে না।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। মহাবিশ্ব ও এর ভেতরে যা কিছু আছে, সব মহান আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। যদি তা-ই হয়, তবে যৌক্তিকভাবেই মহাবিশ্বে; যেটাকে ইউরোপীয়রা 'প্রকৃতি' বলে, কোনো পরস্পর বিরোধিতা থাকতে পারে না। একইভাবে জীবন এবং এর বিভিন্ন রূপের মধ্যেও কোনো পরস্পর বিরোধিতা থাকতে পারে না। মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে, যেসব তথ্য সে ইন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে অর্জন করে আর চিন্তার মাধ্যমে যে জ্ঞানে সে পৌঁছায়—তার মধ্যেও থাকতে পারে না কোনো পরস্পর বিরোধিতা। মানুষ যা প্রত্যক্ষ করছে, সেটাও মহান আল্লাহ তৈরি করেছেন, মানুষের বুদ্ধিমত্তাও মহান আল্লাহ তৈরি করেছেন এবং মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোও মহান আল্লাহরই তৈরি। সবগুলোর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এক।

ইসলাম বলে জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস হলো ওহি। ওহি বিশুদ্ধ ও নিখুঁত। সব ধরনের মিথ্যা ও পার্থিব ত্রুটি থেকে মুক্ত। তবে ইসলাম মানুষের চিন্তা, যুক্তি, পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে অস্বীকার করে না। বস্তুজগৎ একটা খোলা বইয়ের মতো। এ বইকে আল্লাহ এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে মানুষ এ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে—,–পর্যবেক্ষণ, যুক্তি

বা চিন্তার মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞানে উপনীত হয়, সেখানে ভুল হয় এবং হবে। এই জ্ঞান সীমিত মানব প্রচেষ্টার ফল। অবধারিতভাবেই এতে ত্রুটি থাকবে, বারবার একে যাচাই ও হালনাগাদ করতে হবে। কিন্তু ওহির জ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে সত্য, নিখুঁত ও বিশুদ্ধ।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মানুষকে তৈরি করেছেন মহাবিশ্ব, বস্তুজগৎ এবং প্রাণিজগতের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ করে। এই সবকিছু মহান আল্লাহর সৃষ্টি, সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল এবং সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ বলেছেন,

> মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি সকল (সৃষ্ট) বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।' (সূরা ত্বহা, ২০ : ৫০)
>
> আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর করেছেন (দেহের প্রতিটি অঙ্গকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন। (সূরা আলা, ৮৭ : ১-৩)
>
> আর প্রত্যেক বস্তু আমরা সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৯)
>
> ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, আর দুই ডানা সহযোগে উড্ডয়নশীল এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতো একটি উম্মাত নয়...(সূরা আনআম, ৬ : ৩৮)
>
> মূসা বললেন, 'এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে রয়েছে, আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।' (সূরা ত্বহা, ২০ : ৫২-৫৩)
>
> মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব। (সূরা ত্বহা, ২০ : ৫৫)
>
> পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন;- জমিন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সে সবকিছু থেকেও, যা তারা জানে না। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৬)
>
> তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা, ৪২ : ১১)

কুরআনের অনেক আয়াতে সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য, সামঞ্জস্য এবং সহযোগিতার কথা এসেছে। উদাহরণ হিসেবে কিছু আয়াত আমরা এখানে তুলে ধরছি,

> আমি কি জমিনকে (তোমাদের জন্য) শয্যা বানাইনি? আর পর্বতসমূহকে পেরেক? আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি

জোড়ায় জোড়ায়। আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম, রাতকে করেছি আবরণ। আর আমি দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়। আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ। আর আমি বর্ষণ করি বৃষ্টিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি, যাতে আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ, ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান। (সূরা নাবা, ৭৮ : ৬-১৬)

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন; তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর তার দিবালোক প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। তার ভিতর থেকে বের করেছেন পানি ও তৃণভূমি। আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণস্বরূপ। (সূরা নাযিআত, ৭৯ : ২৭-৩৩)

অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করে।¦ নিশ্চয় আমি প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি। তারপর জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর ও শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর, ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা, আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা। তোমাদের আর তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর ভোগের জন্য। (সূরা আবাসা, ৮৭ : ২৪-৩২)

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তার দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন। এতে ওই সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন আছে, যারা লক্ষ করে শোনে। আর নিশ্চয় গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর। আর খেজুর ও আঙুর ফল থেকে তোমরা মদও প্রস্তুত করো এবং উত্তম খাদ্যও।¸ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। আর আপনার রব মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, ‘ঘর তৈরি করো পাহাড়ে, গাছে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে, তাতে।¸ অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের (শেখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করো। এর পেট থেকে রং-বেরঙের পানীয় বের হয়,+ এতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৬৫-৬৯)

আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আবাস করেছেন এবং তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা খুব সহজেই তোমরা সফরকালে ও অবস্থানকালে বহন করতে পারো। আর তাদের পশম, তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী ও ভোগ-উপকরণ (তৈরি করেছেন)। আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৮০-৮১)

আমরা যা বলতে চাচ্ছি, তা হলো—মহাবিশ্ব ও মানুষের মধ্যে এক মৌলিক সঙ্গতি ও ঐক্যের সম্পর্ক বিদ্যমান। ওহির মাধ্যমে

পাওয়া নিখুঁত জ্ঞানের পাশাপাশি, মহাবিশ্ব ও প্রকৃতিকে সম্ভাব্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলাম। ইসলাম আমাদের শেখায় প্রকৃতির খোলা বই থেকে কিংবা মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির গভীর থেকে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। এখানে আমরা প্রথমে এমন কিছু আয়াত তুলে ধরছি, যেগুলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে আমাদেরকে জানায়—

> নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত, (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৯)

> তারপর আমরা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের ওপর; কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। (সূরা জাসিয়া, ৮৫ : ১৮)

> আলিফ, লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ। নিশ্চয় আমি একে আরবি কুরআনরূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমরা আপনার কাছে উত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি, ওহির মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে; যদিও এর আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১-৩)

> আমি বললাম, 'তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোনো হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা কুফরি করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামি; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা বাকারা, ২ : ৩৮-৩৯)

> স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের ওপর উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) 'যা দিলাম, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করো এবং শোনো।' (সূরা বাকারা, ২ : ৯৩)

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে প্রকৃতির খোলা বই এবং মানুষের ভেতরে থাকা গোপন বইয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। মানুষকে বলা হয়েছে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা করতে—

> আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে জমিনে, আর (নিদর্শন আছে) তোমাদের মাঝেও, তবুও কি তোমরা দেখো না? (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২০-২১)

> অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব, বিশ্বজগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সবকিছুর ওপর সাক্ষী? (সূরা ফুসসিলাত, ৮১ : ৫৩)

> (কিয়ামাত হবে, একথা যারা অমান্য করে) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? আর জমিনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে? অতএব আপনি উপদেশ দিন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নন। (সূরা গাশিয়া, ৮৮ : ১৭-২২)

তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই সেগুলোকে ধরে রাখেন না। নিশ্চয় এতে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৭৯)

নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তার দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার মাঝে, যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৪)

মানবীয় বুদ্ধির ভূমিকার কথাও কুরআনে এসেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আমরা তাই সৃষ্টির মাঝে থাকা নিদর্শন, ওহির মাধ্যমে পাওয়া সত্য এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তার করার আহ্বান খুঁজে পাই—

বলুন, 'আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি -: তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখো—তোমাদের সাথির মধ্যে কোনো উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৬)

তারা কি কুরআনের মর্ম বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট হতে আসত, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত। (সূরা নিসা, ৪ : ৮২)

তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়। বরং অন্ধ বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৬)

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে, 'হে আমাদের রব!, আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র। অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।' (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯১)

আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৭৮)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ জ্ঞানের প্রতিটি উৎসকে স্বীকার করে এবং তাদেরকে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে রাখে ভারসাম্যপূর্ণভাবে। কোনো এক উৎসকে দেবতা বানানো হয় না। কুরআনে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং মানুষের নিজেকে নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার প্রতি অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে,+ যাতে সৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে স্রষ্টার ব্যাপারে। যাতে করে মহান আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম থেকে তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা হলেও ~~মানুষ~~ ধারণা পেতে পারে। মহান আল্লাহর নিয়ামাতসমূহ উপলব্ধি করে আল্লাহর প্রতি যাতে মানুষের

ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

মানুষের উপলব্ধি এবং বুদ্ধিমত্তা স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। মহাবিশ্বের সবকিছু পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন ঘটনা থেকে শুরু করে মানুষের অবস্থা, অনুভূতি, চিন্তাধারা সবই পরিবর্তনশীল। এই বাস্তবতা থেকে মানুষের মন এই উপলব্ধিতে পৌঁছায় যে, এই সবকিছুর পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি অপরিবর্তনীয়, চিরস্থায়ী। সবকিছু ক্ষয়ে যায়, সবকিছু একসময় মুছে যায় কিন্তু আল্লাহর চিরঞ্জীব, আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম।

সৃষ্টিজগৎ সুবিন্যস্ত, ভারসাম্যপূর্ণ। কিছু নির্দিষ্ট বিধিবিধান, নিয়মনীতি দ্বারা সৃষ্টিজগৎ পরিচালিত হয়। প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো হয় নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে। মহাবিশ্বের মধ্যে সবসময় কার্যকর থাকে কিছু মৌলিক নীতি। সবকিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, বিন্যাস, মাপ ও হিসাব আছে। যার অর্থ হলো—জীবন উদ্দেশ্যহীন নয়। মানুষকে এখানে পরিত্যাগ করা হয়নি। এই জীবন এক পরীক্ষা এবং এর প্রতিদান আছে। আর এই সমস্ত কিছু ভারসাম্য এবং ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ কারণেই ইসলামে প্রকৃতির খোলা বই থেকে জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, পাশাপাশি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে সৃষ্টিজগৎ ও স্রষ্টাকে নিয়ে ভাবতে। এভাবে ইসলাম জ্ঞানের সবগুলো উৎসের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে। এখানে কোনো সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নেই। কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তাতে আমরা কেবল এগুলোই দেখি। জ্ঞানের মৌলিক উৎস ওহি—একথা বলার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিমত্তা কিংবা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয় না। ঠিক যেমনটা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে—এটা বলার দ্বারা মানবীয় বুদ্ধিমত্তা বা ওহিকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

মানুষের ভূমিকা ও মহাবিশ্বের ভূমিকা, মানুষের অবস্থান আর মহাবিশ্বের অবস্থানের মাঝেও আছে ভারসাম্য। এ ব্যাপারে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ওই ধরনের বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে নিরাপদ, যেগুলো অন্যান্য ওয়ার্ল্ডভিউকে আক্রান্ত করেছে। মানবরচিত দর্শন আর বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকালে ইসলামের স্পষ্টতা ও বিশুদ্ধতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্লেটোর[15] মতে, বস্তু ছিল গুরুত্ব এবং মূল্যের দিক থেকে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

> “প্লেটোর দর্শনে অস্তিত্ব দুটি বিপরীতমুখী স্তরে বিভক্ত : পরম বুদ্ধিমত্তা এবং পরম বস্তু। পরম বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমতা। পরম বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো অক্ষমতা। যে সত্তার মাঝে বুদ্ধিমত্তার অংশ যত বেশি, তার অবস্থান তত ওপরে। যার মধ্যে বস্তুর অংশ যত বেশি, তার অবস্থান তত নিচে। পরম বস্তু হলো পরম বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে।[16]
>
> প্লেটোর চিন্তাধারা অনুসরণ করে প্লটিনসও মনে করত, বস্তু হলো সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের অস্তিত্ব। পরম একক থেকে বিচ্ছুরিত হয় পরম বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমত্তা থেকে আসে আত্মা। আত্মা সৃষ্টি করে তার নিম্নতর সত্তাগুলোকে।[17] এভাবে ধাপে ধাপে নিচে নামতে নামতে আমরা বস্তুতে এসে পৌঁছাই। আর বস্তুর জগৎ হলো কলুষতার জগৎ।[18]

চার্চের শেখানো খ্রিষ্টবাদ অনুযায়ী বস্তুজগৎ মন্দের প্রতিনিধিত্ব করে, কল্যাণ কেবল আত্মার জগতে। যা কিছু শরীরী, যা কিছু বস্তুগত, তা পরিত্যাগ করতে হবে;+ যাতে করে মন্দ থেকে বাঁচা যায়, মোক্ষলাভ করা যায়। এমন ধারণা হিন্দু ধর্মেও পাওয়া যায়। একদিকে

আমরা বস্তুজগতের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্ম এবং দর্শনে এই ধরনের চিন্তার পুনরাবৃত্তি দেখি, অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তায় দেখা যায় এই অবস্থানকে পুরোপুরি উল্টে দেওয়ার প্রবণতা। অগুস্ত কন্টের পসিটিভিসম বলে, সকল প্রাণী এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবনকারী প্রকৃতি। তাদের দর্শনে প্রকৃতিকে একরকম দেবতার আসনে বসানো হয়। অনেকে আবার বস্তুজগতের একটি নির্দিষ্ট দিক; অর্থনীতিকে; দেবত্বের আসনে বসিয়েছে। যেমন: মার্ক্সবাদের মতে মানুষ ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা মূল শক্তি হলো অর্থনীতি।

এই দর্শনগুলো বিভিন্ন প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে এগুলোর দূরত্ব অনতিক্রম্য। ইসলাম মানুষকে সম্মানিত করে,; কিন্তু বস্তুজগৎকে হেয় করে না। মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনকারী, অভিভাবক, মালিক। মানুষ এবং বস্তুজগৎ তাঁর সৃষ্টি। দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক ভারসাম্য এবং সহযোগিতার। মানুষ মহান আল্লাহর কাছে সম্মানিত। বস্তুর ওপর মানুষকে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে, যাতে সে এর রহস্য জানতে পারে। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী একে পরিবর্তন করতে পারে, কাঠামো দিতে পারে, রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান বিশ্বাসী মানুষকে বিনয়ী করে, তার মনে তৈরি করে শ্রদ্ধার অনুভূতি। ইসলামের শিক্ষা মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়, তার জীবনকে অর্থবহ করে। মর্যাদার জন্য মানুষকে তখন বস্তুর মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

এগুলো হলো ইসলামি কনসেপ্টে ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্যের কিছু দিক। এই দৃষ্টান্তগুলো অনুযায়ী পাঠক নিজে আরও অধ্যয়নধ্যায়ন বা চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন।[19]

---

[1] শাব্দিকভাবে ‘ক্বাদর’ (قَدَرٌ)-এর অর্থ—পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি। আর ‘তাকদীর’ এর অর্থ—পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি। তাকদীর হচ্ছে—সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ তাআলার পূর্ব জ্ঞান ও হিকমাহর দাবি অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য সবকিছু নির্ধারণ। সূত্র : শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ), ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের আকীদা’, পৃষ্ঠা ৮২। (অনুবাদক)

[2] সূরা শূরা, ৪২ : ১১।

[3] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৩।

[4] সূরা রাহমান, ৫৫ : ২৬-২৭।

[5] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৩।

[6] সূরা রা'দ, ১৩ : ১৬।

[7] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫২।

[8] সূরা নূর, ২৪ : ১৯।

[9] সূরা ইখলাস, ১১২ : ৪।

[10] সূরা শূরা, ৪২ : ১১।

[11] দ্রষ্টব্য—সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ২৯। (অনুবাদক)

[12] দ্রষ্টব্য—সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫। (অনুবাদক)

[13] এই লেখকের 'মাশাহিদুল কিয়ামাহ ফিল কুরআন' (مَشَاهِدُ الْقِيَامَةِ فِي الْقُرْآنِ) দ্রষ্টব্য।

[14] প্রাগুক্ত।

[15] প্লেটো : প্লেটো বা 'আফলাতুন' (মৃ. খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৮) বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের ছাত্র। প্লেটোর প্রবর্তিত দার্শনিক ধারা প্লাতনবাদ বা Platonism নামে পরিচিত। প্লেটোর চিন্তা বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন ধারাও প্লেটোর চিন্তাকে নানা মাত্রায় গ্রহণ করেছে, যা নিয়ে আগের অধ্যায়গুলোতে সাইয়্যিদ কুতুব আলোচনা করেছেন। তবে খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ওপর প্লেটোর চিন্তার প্রভাব প্রগাঢ়। ইংরেজ অধ্যাপক, যাজক, ধর্মতাত্ত্বিক ও লেখক, উইলিয়াম র‍্যালফ ইঙ্গের মতে—'প্লাতনবাদ খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের কাঠামোর অপরিহার্য অংশ। আমি নির্ভয়ে বলছি—এই ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে অন্য কোনো দর্শন বিনা দ্বন্দ্বে কাজ করতে পারে না। খ্রিষ্টীয় মতবাদকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করে সে মতবাদ থেকে প্লাতনবাদকে বিচ্ছিন্ন করা একেবারেই অসম্ভব।' বার্ট্রান্ড রাসেলের 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃত। (অনুবাদক)

[16] আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৩৭।

[17] প্লটিনস : প্লটিনস (মৃ. ২৭০) নবপ্লাতনবাদ বা Neoplatonism-এর প্রবর্তক। তার জন্ম মিশরে, লেখাপড়া আলেকজান্দ্রিয়াতে। প্লতিনস তিনটি সত্তার কথার বলে : পরম একক বা অদ্বিতীয় (One), বুদ্ধিমত্তা (Intellect/Nous) এবং আত্মা (Soul)। সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে পরম একক। তারপর অবস্থান পরম বুদ্ধিমত্তার এবং তারপর আত্মার। পরম একক থেকে পরম বুদ্ধিমত্তা বিচ্ছুরিত হয়। আর পরম বুদ্ধিমত্তা থেকে আসে আত্মা। আর আত্মাই বস্তুজগৎ ও সমস্ত জীবের স্রষ্টা। সামনের অধ্যায়গুলো প্লটিনসের দর্শন নিয়ে আরও আলোচনা আসবে। (অনুবাদক)

[18] আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৮৮।

[19] এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন— মুহাম্মাদ কুতুব, 'মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' (مَنْهَجُ التَّرْبِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ)।